অধ্যায় - ১৮-১৯

শ্রী হেমাডপন্তের উপর বাবার কৃপা কিভাবে হয়, শ্রী সাঠে ও শ্রীমতি দেশমুখের গল্প, উত্তম বিচারকে উৎসাহ প্রদান, উপদেশে নবীনতা, নিন্দে সম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরিশ্রমের জন্য মজুরী।

ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য লালায়িত এক ধনী ব্যক্তির সাথে বাবা কিরূপ ব্যবহার করেন, তার বর্ণনা হেমাডপন্ত গত দুই অধ্যায়ে দিয়েছেন। এবার হেমাডপন্তের উপর বাবা কিরূপ অনুগ্রহ করেন, উত্তম বিচারকে উৎসাহ দিয়ে সেগুলি ফলীভূত করেন এবং আত্মোন্নতি ও পরিশ্রমের প্রতিফলের সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ দেন - সেই সব কথাই এই দুটি অধ্যায়তে বর্ণনা করা হবে।

পূর্ব বিষয় ঃ-

এ কথা তো সবাই জানে যে, সদ্‌গুরু সব সময় নিজের শিষ্যের যোগ্যতার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। তিনি উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে আত্মানুভূতির দিকে শিষ্যদের এগিয়ে দেন, যাতে ওদের মন একটুও দোলাচলে না থাকে। এই বিষয়ে কিছু লোকের এই রকম মতও শোনা যায় যে, যে শিক্ষা বা উপদেশ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় সেটা অন্যদের মাঝে প্রসারিত করা উচিত নয়। ওদের এই ধারণা যে, সেটি প্রকাশ করলে তার গুরুত্ব কম হয়ে যায়। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সংকুচিত। সদ্‌গুরু বর্ষা ঋতুর মেঘের মত সর্বত্র একরকম বর্ষণ করেন, অর্থাৎ তিনি নিজের অমৃততুল্য উপদেশ বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করেন। প্রথমে ওর সারতত্ত্ব গ্রহণ করা উচিত, তারপর সংকীর্ণতা ত্যাগ করে অন্য লোকেদের মাঝেও সেটা প্রচার করা উচিত। এই নিয়ম জাগ্রত ও স্বপ্নে-দুই অবস্থাতেই প্রাপ্ত উপদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ - বুদ্ধকৌশিক ঋষি স্বপ্নে প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ 'রাম রক্ষা স্তোত্র' সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য প্রকট করে দেন। এক দয়াময়ী মা প্রয়োজনে যেরূপ ছেলেকে তেঁতো ওষুধ জোর করে খাওয়ান, সেই রকমই শ্রী সাইবাবাও নিজের ভক্তদের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি নিজের পদ্ধতি গুপ্ত না রেখে সম্পূর্ণ স্পষ্টতাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তাই যে ভক্তরা তাঁর উপদেশগুলি পূর্ণ রূপে পালন করত, তারা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করতে সফল হয়েছে। **শ্রী সাইবাবার ন্যায় সদ্‌গুরুই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়ে আত্মার**

দিব্যতা অনুভব করিয়ে দিতে সর্বসমর্থ। বিষয়-বাসনার প্রতি আসক্তি নষ্ট করে তিনি ভক্তদের ইচ্ছেগুলি পুরণ করেন যার ফলস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় ও জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। এই সব শুধু তখনই সম্ভব, যখন আমরা সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত করে তাঁর সেবা করার পর তাঁর প্রেম অর্জন করতে পারি। তখন ভক্তকামকল্পতরু ভগবানও আমাদের সাহায্য করেন। তিনি আমাদের কষ্ট ও দুঃখ হতে মুক্ত করে সুখী করেন। এই রকম উন্নতি কেবল সদ্‌গুরুর কৃপার দ্বারাই সম্ভব, যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক। তাই আমাদের সব সময় সদ্‌গুরুরই খোঁজ করা উচিত। এবার আমরা মুখ্য বিষয়ের দিকে আসি।

শ্রী সাঠে ঃ-

অনেক বছর আগে ক্রফর্ডের শাসন কালে শ্রী সাঠে নামে এক ভদ্রলোক কিছু খ্যাতি প্রাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু এই শাসন বম্বের লর্ড রে দমন করে দেন। শ্রী সাঠের ব্যবসায় যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ার দরুণ ওঁর বেশ ধাক্কা লাগে। উনি অত্যন্ত দুঃখী ও নিরাশ হয়ে পড়েন ও বাড়ী ছেড়ে একান্তে কোন স্থানে বাস করার ইচ্ছে ওনার মনে জাগে। বেশীর ভাগ সময় মানুষ বিপদে এবং দুর্দিনেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসও এই সময়ই বাড়ে। আমরা কষ্ট দূর করার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি। যদি আমাদের পাপ কর্ম অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে ঈশ্বরও আমাদের সাক্ষাৎ কোন সন্তপুরুষের সাথে করিয়ে দেন, যিনি আমাদের কল্যাণার্থে সঠিক পথ দেখান। ঠিক এমনটাই শ্রী সাঠের জীবনেও ঘটে। ওঁর এক বন্ধু ওঁকে শিরডী যাওয়ার পরামর্শ দেন। মনের শান্তির জন্য এবং ইচ্ছাপূর্তির নিমিত্তে সেখানে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে লোকের দল আসত ও আজও আসে। শ্রী সাঠের এই পরামর্শটি খুবই ভালো লাগে এবং ১৯১৭ সালে উনি শিরডী যান। বাবার সনাতন, পূর্ণব্রহ্ম, স্বয়ং দীপ্তিমান, নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বরূপ দর্শন করে ওঁর মনের সমস্ত ব্যগ্রতা নষ্ট হয়ে চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়ে যায়। উনি ভাবেন- "গত জন্মের সঞ্চিত শুভ কর্মের ফল স্বরূপই আজ আমি শ্রী সাইবাবার পবিত্র চরণে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।" শ্রী সাঠে ছিলেন দৃঢ়চিত্ত পুরুষ। তাই উনি শীঘ্রই 'গুরু চরিত্র'-র অধ্যয়ণ শুরু করে দেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই যখন 'চরিত্র'-র প্রথম অধ্যয়ণ শেষ হয়ে যায়, তখন বাবা সেই রাতেই ওঁকে একটি স্বপ্ন দেন। স্বপ্নটি এইরূপ ছিল -

বাবা নিজের হাতে 'চরিত্র'-টি ধরে আছেন ও শ্রী সাঠেকে কোন একটি বিষয় বোঝাচ্ছেন। শ্রী সাঠে সামনে বসে মন দিয়ে শুনছেন। ঘুম ভাঙ্গতেই স্বপ্নের কথা

মনে করে ওঁর খুব আনন্দ হয়। উনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে এটা তো বাবার পরম কৃপা যে এইরূপ অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা প্রাণীদের জাগিয়ে তাদের গুরু চরিত্রর অমৃত পান করার সৌভাগ্য প্রদান করেন। উনি এই স্বপ্নটির কথা কাকা সাহেব দীক্ষিতকেও বলেন। তাঁকে শ্রী সাইবাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন- "এর অর্থ কি - এক সপ্তাহের পাঠ কি পর্য্যাপ্ত না আবার আরেকটি পাঠ শুরু করা উচিত?" শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত উচিত সুযোগ দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "হে দেব! এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আপনি শ্রী সাঠেকে কি উপদেশ দিতে চাইছেন? উনি কি পাঠ বন্ধ করবেন নাকি চালিয়ে যাবেন? উনি এক সরল হৃদয়ের ভক্ত। তাই আপনি ওঁর মনোকামনা পূরণ করুন। হে দেব! কৃপা করে ওঁকে এই স্বপ্নের যথার্থ অর্থ বুঝিয়ে দিন।" তখন বাবা বলেন- "ওঁর গুরুচরিত্র আরেক সপ্তাহ পড়া উচিত। যদি উনি মন দিয়ে পাঠ করেন, তাহলে ওঁর মন শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং শীঘ্রই ওঁর কল্যাণ হবে। ঈশ্বরও প্রসন্ন হয়ে ওঁকে এই সংসারের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে দেবেন।" এই সময় শ্রী হেমাডপন্তও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বাবার চরণ সেবা করছিলেন। বাবার কথা শুনে ওঁর মনে হয় যে 'সাঠে কেবল এক সপ্তাহের পাঠেই মনোবাঞ্ছিত ফল পেয়ে গেলেন, আর আমি গত চল্লিশ বছর ধরে 'গুরু চরিত্রে', পাঠ করছি যার পরিণাম আজ পর্যন্ত পেলাম না। ওঁর কেবল সাত দিনের শিরডী অবস্থান সফল হয়ে গেল আর আমার গত সাত বছরের (১৯১০-১৭) বাস কি ব্যর্থ হয়ে গেল? চাতক পাখীর মত আমি সর্বদা ঐ কৃপা ঘন মেঘের (বাবা) পথ চেয়ে বসে থাকি, যে কখন তিনি আমার উপর অমৃত বর্ষণ করবেন। তিনি কখন আমায় উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করবেন?' এই কথা ওঁর মনে উঠতে না উঠতেই বাবা সেগুলি তক্ষুনি জেনে গেলেন। এমনটি অনেক ভক্তরাই অনুভব করেছে যে তাদের মনের সমস্ত গতিবিধি জেনে বাবা তক্ষুনি কুবিচার দমন করে উত্তম বিচারগুলিকে উৎসাহিত করতেন। হেমাডপন্তের এই রকম মনোভাব দেখে বাবা তক্ষুণি তাঁকে শামার কাছে গিয়ে তার সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতে ও তার কাছ থেকে পনেরো টাকা দক্ষিণা আনতে আদেশ দেন। তাঁর কথা অবজ্ঞা করে, এমন সাহস কার থাকতে পারে? শ্রী হেমাডপন্ত অবিলম্বে শামার বাড়ী গিয়ে পৌঁছন। সেই সময় শামা স্নান করে ধূতি পরছিলেন। উনি বেরিয়ে এসে হেমাডপন্তকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি এখানে কি করে? মনে হচ্ছে আপনি মস্‌জিদ থেকে আসছেন। এত উদাস কেন? আপনি একলা কেন? আসুন, বসুন এবং একটু বিশ্রাম করুন। ততক্ষনে আমি পূজো ইত্যাদি সেরে নিই। পান ইত্যাদি গ্রহণ করুন। তার পর আমরা আনন্দ সহকারে কথাবার্তা বলব।" এই বলে উনি ভেতরে চলে

যান। বারান্দায় বসে-বসে হেমাডপন্তের দৃষ্টি জানলার উপরে রাখা 'নাথ ভাগবতের' উপর পড়ে। 'নাথ ভাগবৎ' শ্রী একনাথ দ্বারা রচিত মহাভাগবতের একাদশ স্কন্ধের মারাঠী ভাষায় লেখা একটি প্রসিদ্ধ টীকা। শ্রী সাইবাবার আজ্ঞানুসারে শ্রী বাপুসাহেব যোগ এবং শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত শিরডীতে নিত্য ভগবতগীতা (মারাঠী টীকা যার নাম ভাবার্থ দীপিকা, সহিত) বা জ্ঞানেশ্বরী (কৃষ্ণ ও ভক্ত অর্জুন কথোপকথন), নাথ ভাগবৎ (শ্রীকৃষ্ণ - উদ্ধব কথোপকথন) এবং একনাথের মহান গ্রন্থ 'ভাবার্থ রামায়ণ' পড়তেন। ভক্তগণ বাবাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে কখনো তিনি আংশিক উত্তর দিতেন এবং কখনো ওদের ভাগবৎ তথা প্রমুখ গ্রন্থগুলি শ্রবণ করতে বলতেন। সেগুলি শুনে ভক্তরা নিজেদের প্রশ্নের পূর্ণরূপে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে যেত। শ্রী হেমাডপন্ত 'নাথ ভগবৎ'-এর কিছু অংশ প্রতি দিন পড়তেন।

আজ ভোরবেলা মস্‌জিদে যাওয়ার সময় কিছু ভক্তদের সৎসঙ্গের দরুণ উনি নিজের পাঠ অসম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। জানলা থেকে গ্রন্থটি উঠিয়ে সেটি খুলতেই, নিজের অপূর্ণ পাঠের পৃষ্ঠাটি দেখে ওঁর খুব আশ্চর্য্য লাগে। উনি ভাবেন- "বাবা বোধহয় এই কারণেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি নিজের শেষ পাঠটুকু সেরে নিতে পারি।" এই ভেবে উনি নিজের পাঠ শুরু করেন। পাঠ পুরো হতেই শামাও বেরিয়ে আসেন এবং ওদের দুজনের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয়। হেমাডপন্ত বলেন- "আমি বাবার একটি বার্তা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। উনি আমাকে আপনার কাছ থেকে ১৫ টাকা দক্ষিণা আনতে ও কিছুক্ষণ আপনার সাথে কথাবার্তা বলে আপনাকে আমার সাথে মস্‌জিদে ফিরে যেতে বলেছেন।" শামা অবাক হয়ে বলেন- "আমার কাছে তো এক নয়া পয়সাও নেই। তাই আপনি টাকার বদলে দক্ষিণায় আমার পনেরোটি নমস্কার নিয়ে যান।" তখন হেমাডপন্ত বলেন- "ঠিক আছে, আমি আপনার পনেরোটা নমস্কার স্বীকার করলাম। আসুন, এবার আমরা কিছু গল্প-গুজব করি, এবং কৃপা করে বাবার কিছু লীলা আমায় শোনান, যাতে আমার পাপ নষ্ট হয়।" শামা বললেন- "তাহলে একটু বসুন! এই ঈশ্বরের লীলা অদ্ভুত। কোথায় আমি একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ আর আপনি কত বিদ্বান ব্যক্তি। এখানে আসার পর আপনি বাবার অনেক লীলা দেখেছেন। সেগুলি আপনার সামনে কি করেই বা বর্ণনা করি? আচ্ছা, এই পান-সুপূরী খান, ততক্ষণ আমি কাপড়টা পরে নিই।"

একটু পরে শামা ফিরে আসেন এবং তারপর দুজনের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুরু হয়-

শামা বললেন- "এই পরমেশ্বরের (বাবা) লীলা অন্তহীন, যার কোন কূল নেই। তিনি তো লীলায় অলিপ্ত থেকে সদাই বিনোদ করেন। সেগুলি আমরা চাষারা কি বা বুঝতে পারবে? বাবা স্বয়ংই কেন বললেন না? আপনার মত বিদ্বানকে আমার মত মূর্খের কাছে কেন পাঠালেন? তাঁর কার্য্যপ্রণালী বোঝা কঠিন। আমি শুধু এতটাই বলতে পারি সেগুলি লৌকিক নয়।" এই রূপ ভূমিকার সাথে-সাথেই শামা বলেন- "এবার আমার একটা ঘটনা মনে পড়েছে, যেটা আমি ব্যক্তিগত রূপে জানি। **যেমন ভক্তদের নিষ্ঠা ও ভাব হয়, বাবাও সে মতই তাদের সাহায্য করেন। কখনো-কখনো তো বাবা ভক্তের কঠিন পরীক্ষা নেওয়ার পরই তাকে উপদেশ দেন।**" 'উপদেশ' শব্দটি শুনে সাঠের গুরু চরিত্র পাঠের ঘটনাটি তক্ষুনি মনে পড়ায় হেমাডপন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। উনি ভাবেন- "বাবা বোধহয় আমার মনের অস্থিরতা দূর করার জন্যই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।" তবুও নিজের মনের কথা প্রকাশ না করে, শামার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। সেই সব কাহিনীগুলির কেবল একটাই বক্তব্য দেখা যাচ্ছিল যে, বাবার মন নিজের ভক্তদের প্রতি গভীর দয়া ও স্নেহে ভরা। লীলাগুলি শ্রবণ করে হেমাডপন্ত আন্তরিক উল্লাস অনুভব করছিলেন। এবার শামা নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন -

শ্রীমতি রাধাবাঈ দেশমুখ ঃ-

একসময় এক বৃদ্ধা, শ্রীমতি রাধাবাই দেশমুখ - খাশাবা দেশমুখের মা-বাবার নাম শুনে সঙ্গমনরের কিছু লোকেদের সাথে শিরডী আসেন। বাবার শ্রীদর্শন পেয়ে উনি অতি প্রসন্ন হন। শ্রী সাই চরণে ওঁর অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। তাই উনি স্থির করেন যে, বাবার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন। আমরণ অনশনের দৃঢ় নিশ্চয় করে উনি নিজের বিশ্রাম গৃহে এসে অন্ন-জল ত্যাগ করেন। এই ভাবে তিন দিন কেটে যায়। আমি এই বৃদ্ধার অগ্নিপরীক্ষা দেখে ভয় পেয়ে যাই এবং বাবাকে এইরূপ প্রার্থনা করি- "দেব! আপনি আবার এটা কি শুরু করেছেন? কত লোকেদেরই তো আপনি এখানে টেনে আনেন। আপনি তো ঐ বৃদ্ধ মহিলাকে চেনেন। যদি আপনি ওঁকে কৃপা করে উপদেশ না দেন আর দুভার্গ্যবশতঃ ওঁর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে লোকেরা অকারণে আপনাকেই দোষ দেবে। সবাই বলবে বাবার কাছে উপদেশ না পাওয়ার জন্যই ওর মৃত্যু হয়েছে। তাই দয়া করে ওকে আশীষ ও উপদেশ দিন।" বৃদ্ধার এই রূপ দৃঢ় সংকল্প দেখে বাবা ওকে ডেকে পাঠান। মধুর উপদেশ দিয়ে ওর মনোবৃত্তি পরিবর্তিত করে বলেন- "মা! কেন মিছিমিছি তুমি যাতনা সহ্য করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন

করতে চাইছ? তুমি আমার মা এবং আমি তোমার পুত্র। তুমি আমার উপর দয়া করো এবং আমি যা বলছি সেটা মন দিয়ে শোন, আমি স্বয়ং নিজের কাহিনী তোমায় শোনাচ্ছি এবং তুমি যদি মন দিয়ে সেটা শোনো, তাহলে তুমি অবশ্যই পরম শান্তি লাভ করবে। আমার গুরুর, আমার উপর খুব দয়া ভাব ছিল। তিনি অতি উচ্চকোটীর সাধু ছিলেন। দীর্ঘকাল আমি তাঁর সেবা করি, তবুও তিনি আমার কানে কোন মন্ত্র দেননি। আমি তাঁর থেকে কখনো দূরে যেতে চাইতাম না। আমার প্রবল উৎকণ্ঠা ছিল যে, তাঁর সেবা করে যেভাবেই সম্ভব হোক, মন্ত্র প্রাপ্ত করি। কিন্তু তাঁর রীতি অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথমে আমার মাথা নেড়া করে আমার কাছে দু পয়সা দক্ষিণা চান, যেটা আমি তক্ষুনি দিয়ে দিই। যদি তুমি প্রশ্ন করো যে, আমার গুরু তো পূর্ণ নিষ্কাম ছিলেন - তবে পয়সা চাওয়াটা কি তাঁর পক্ষে শোভণীয় মানা যেতে পারে? এবং তাহলে তাঁকে সর্বরূপে বৈরাগীও বা কিভাবে বলা যেতে পারে? এর উত্তর শুধু মাত্র এইটাই যে, কাঞ্চণকে তিনি সরিয়ে দিতেন, স্বপ্নেও তাঁর এসবের প্রয়োজন ছিল না। ঐ দু পয়সার অর্থ হলো - ১) দৃঢ় নিষ্ঠা ২) ধৈর্য্য। যখন আমি এ দুটি বস্তু তাঁকে অর্পণ করে দিই, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। আমি বারোটি বছর তাঁর শ্রীচরণের সেবায় কাটাই। তিনি আমার ভরন-পোষণ করেন। অতএব আমার ভোজন বা বস্ত্রের কোন অভাব হয়নি। তিনি প্রেমের মূর্তি ছিলেন। অথবা বলা যেতে পারে যে, তিনি প্রেমের সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন। আমি তাঁর সঠিক বর্ণনাই বা কিভাবে করতে পারি? আমার প্রতি তাঁর খুব বেশী স্নেহ ছিল এবং এই রকম গুরু খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে মনে হতো যেন তিনি গম্ভীর মুদ্রায় ধ্যান-মগ্ন আছেন ও তখন আমরা দুজনেই আনন্দে বিভোর হয়ে উঠতাম। অষ্ট প্রহর তাঁর শ্রীমুখের দিকে এক পলকে চেয়ে থাকতাম। আমি ক্ষুধা বা তৃষ্ণার বোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাঁর দর্শন না পেলে আমি অশান্ত হয়ে উঠতাম। আমার তো সর্বদা তাঁর কথাই মনে হত - তাঁর চিন্তাতেই ধ্যানমগ্ন থাকতাম। অতএব আমার মন তাঁর চরণকমলেই লীন হয়ে যায়। এটা হলো এক পয়সার দক্ষিণা। ধৈর্য্য হলো দ্বিতীয় পয়সা। আমি ধৈর্য্য ধরে বহুকাল গুরুসেবা করি। এই ধৈর্য্যই তোমাকেও ভবসাগরে পার করিয়ে দেবে। ধৈর্য্যই তো মানুষের মনুষত্ব। ধৈর্য্য ধারণ করলেই সমস্ত পাপ এবং মোহ নষ্ট হয়ে সব রকমের বিপদ দূর হয় ও ভয় শেষ হয়ে যায়। এই ভাবে তুমিও নিজের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে পারবে। ধৈর্য্য তো সমস্ত গুণের খনি এবং সৎবিচারের জননী। নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য যেন দুটি যমজ বোন, যাদের মধ্যে দেখা যায় প্রগাঢ় প্রেম।

"আমার গুরু আমার কাছে কোন কিছু আশা করতেন না। তিনি কখনো আমায়

অবহেলা করেননি, বরং তিনি আমাকে সর্বদা রক্ষাই করেছেন। যদিও আমি সব সময় তাঁর চরণের কাছেই থাকতাম, তবুও কদাচিত অন্য জায়গায় গেলেও তাঁর প্রতি আমার প্রেম কম হয়নি। তাঁর কৃপাদৃষ্টি সর্বদা আমার উপর বর্ষিত হত। যেরূপ কচ্ছপী নিজের প্রেম দৃষ্টি দিয়ে নিজের বাচ্চাদের লালন-পালন করে, তারা নদীর এপারে হোক অথবা ওপারে। তাই মা, আমার গুরু তো আমায় কোন মন্ত্র শেখাননি, আমি কি করে তোমার কানে মন্ত্র দিই ? কেবল এইটাই মনে রেখো যে, কচ্ছপ-মায়ের মত শুধু গুরুর প্রেমদৃষ্টির সাহায্যে আমরা সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করতে পারি। তাই **শুধু-শুধু কারো থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করার চেষ্টা কোর না। আমাকেই নিজের বিচারের ও কর্মের লক্ষ্য মানো এবং তখনই তুমি নিঃসন্দেহে পরমার্থ লাভ করবে। আমার দিকে অনন্য ভাবে দেখলে আমিও তোমার দিকে সে ভাবেই দেখব। এই মস্‌জিদে বসে আমি সত্য কথাই বলি। কোন সাধনা বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার দরকার নেই। কেবল গুরুর কথায় বিশ্বাসই পর্যাপ্ত। সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখো যে, গুরুই কর্তা। সে মানুষই ধন্য, যে গুরুর মহানতা বা গুরুত্ব বুঝে তাঁকেই হরি, হর ও ব্রহ্মার (ত্রিমূর্তি) অবতার মানে।**" এই ভাবে বোঝানোর পর বৃদ্ধা মহিলা সান্ত্বনা পান ও বাবাকে প্রণাম করে উপবাস ত্যাগ করেন। এই কাহিনীটি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে এবং তার উপযুক্ত অর্থটির বিষয় বিচার করে হেমাডপন্তের খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। ওঁর মন ভরে ওঠে ও উনি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত আনন্দ-বিভোর হয়ে ওঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। ওঁর এইরূপ অবস্থা দেখে শামা জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি এই ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছেন কেন? বাবার এই ধরনের লীলা তো অনেক আছে, সেগুলির বর্ণনা আমি কোন মুখ দিয়ে করি?"

ঠিক সেই সময় মস্‌জিদে ঘন্টা বাজতে শুরু করে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন পূজো ও আরতি প্রারম্ভ হওয়ার সংকেত। তখন শামা ও হেমাডপন্ত শীঘ্রই মস্‌জিদের দিকে রওনা হন। বাপুসাহেব যোগ পূজো সবে আরম্ভ করেছেন; মহিলারা উপরে দাঁড়িয়েছিল ও পুরুষেরা নীচে মণ্ডপে। সবাই উচ্চস্বরে বাদ্যযন্ত্রের সাথে আরতি গাইছিল। তখনই হেমাডপন্তের হাত ধরে শামা উপরে উঠে যান। উনি বাবার ডান দিকে ও হেমাডপন্ত বাবার সামনে গিয়ে বসেন। ওঁদের দেখে বাবা শামার দক্ষিণাটি চান। তখন হেমাডপন্ত উত্তর দেন- "টাকার বদলে শামা আপনাকে পনেরোটা নমস্কার পাঠিয়েছেন এবং স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন।" বাবা বললেন- "আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমায় বলো তোমরা নিজেদের মধ্যে কি বিষয়ে আলোচনা করছিলে?" তখন ঘন্টা, ঢোল ও সামূহিক গানের

আওয়াজের দিকে কান না দিয়ে হেমাডপন্ত উৎকন্ঠাপূর্বক সেই বার্তালাপ শোনাতে শুরু করেন। বাবাও সমান উৎসাহী। তাই বালিশে হেলান ছেড়ে, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেলেন। হেমাডপন্ত বলেন- "আলোচনাটি খুবই সুখদায়ক ছিল, বিশেষ করে ঐ বৃদ্ধা মহিলাটির কাহিনী খুব অদ্ভুত লাগল। সেটি শুনে আমার মনে হলো যে, আপনার লীলা অন্তহীন এবং এই কাহিনীটির মাধ্যমে আপনি আমার উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছেন।" তখন বাবা বললেন- "এ তো বড় আশ্চর্য্যর কথা! আমার কৃপা তোমার উপর কি করে হলো, খুলে বলত শুনি।" তখন একটু আগে শোনা ঘটনাটি, যেটি ওঁর হৃদয় পটলে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, বাবাকে শুনিয়ে ফেললেন। বাবা গল্পটি শুনে অতি প্রসন্ন হয়ে বলেন- "এর অর্থটাও কি তুমি বুঝতে পেরেছ?" তখন হেমাডপন্ত উত্তর দেন- "আজ্ঞে বাবা, বুঝতে পেরেছি। তাই আমার মনের চঞ্চলতা নষ্ট হয়ে গেছে। এবার যথার্থরূপে আমি বাস্তবিক শান্তি ও সুখ অনুভব করছি এবং আমি সত্য পথটি জেনে গেছি।" তখন বাবা বলেন- "শোন, আমার পদ্ধতিও অদ্বিতীয়। যদি এই গল্পটা মনে রাখো তাহলে তোমার খুবই লাভ হবে। **আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য ধ্যান অত্যন্ত আবশ্যক** এবং যদি তুমি এটির নিরন্তর অভ্যাস করো তাহলে কুপ্রবৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যাবে। আসক্তিশূণ্য হয়ে সর্বদাই তোমার ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। তিনি সব প্রাণীদের মধ্যে ব্যাপ্ত এবং এইরূপ মন একাগ্র হয়ে গেলে তুমি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আমার নিরাকার সচিদানন্দ স্বরূপের ধ্যান করো। যদি তা না পারো, তবে তুমি আমায় এখানে দিন-রাত যেমনটি দেখো সেই রূপই ধ্যান করো। এই ভাবে তোমার বৃত্তিগুলি এক জায়গায় কেন্দ্রিত হয়ে যাবে এবং ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়ের পৃথকত্ব নষ্ট হয়ে, ধ্যাতা চৈতন্যের সাথে একত্ব প্রাপ্ত করে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন হয়ে যাবে। কচ্ছপী নদীর এপারে থাকে ও তার বাচ্চারা ওপারে। ও তাদের দুধ খাওয়ায় না আর বুকের সাথে জড়িয়েও রাখে না। শুধু তার প্রেম-দৃষ্টি দিয়েই তাদের লালন-পালন হয়ে যায়। বাচ্চাগুলিও কিছু না করে শুধু মা'-র কথাই স্মরণ করতে থাকে। কচ্ছপ-মা শুধু তার হিতকর ও স্নেহদৃষ্টি দিয়েই ঐ ছোট-ছোট শিশুগুলিকে অমৃততুল্য আহার ও আনন্দ প্রদান করে। এমনি হচ্ছে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ।" বাবা এই শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করা মাত্রই আরতি শেষ হয়ে যায়। সবাই উচ্চস্বরে বলে ওঠে- "শ্রী সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু সাইনাথ মহারাজের জয়।" প্রিয় পাঠকগণ! কল্পনা করুন যে, আমরা সবাই এই সময় ঐ ভীড়ের ও জয়জয়কার ধ্বনির মাঝে সম্মিলিত আছি।

আরতি শেষ হওয়ার পর প্রসাদ বিতরণ হয়। বাপু সাহেব যোগ রোজকার মতন এগিয়ে আসেন এবং বাবাকে প্রণাম করে কিছু মিছরি দেন। বাবা এই মিছরি

হেমাডপন্তকে দিয়ে বলেন- "যদি তুমি এই কাহিনীটি ভাল ভাবে সব সময় মনে রাখো, তাহলে তোমার অবস্থাও এই মিছরির ন্যায় মিষ্টি হয়ে তোমার সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তুমি চিরসুখী হবে।" হেমাডপন্ত বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্তুতি করেন- "প্রভু! দয়া করে এই ভাবে সদৈব আমায় রক্ষা করবেন।" তখন বাবা হেমাডপন্তকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন যে ওঁর বাবার কথাগুলি শ্রবণ করে নিত্য মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বকে গ্রহণ করা উচিত। তখন ঈশ্বরের এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মরণ ও ধ্যানের ফলস্বরূপ তিনি স্বয়ং হেমাডপন্তের সামনে নিজের স্বরূপকে প্রকট করবেন। প্রিয় পাঠকগণ, হেমাডপন্ত সেই সময় মিছরির প্রসাদ পেয়েছিলেন, তাই আজ আমরা এই কথামৃত পান করার সুযোগ পেয়েছি। আসুন, আমরাও ঐ কথা মনন করি এবং তার সারতত্ত্ব গ্রহণ করে বাবার কৃপায় সুস্থ ও সুখী হই।

১৯ অধ্যায়ের শেষে হেমাডপন্ত কিছু আরো ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, যেগুলি এখানে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের ব্যবহারের বিষয় বাবার উপদেশ ঃ-

নিম্নলিখিত অমূল্য বচন সর্বসাধারণ ভক্তদের জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং যদি সেগুলি মনে রেখে আচরণ করা হয় তো সর্বদা কল্যাণ হবে। যতক্ষন কারো সাথে পূর্ব সম্পর্ক বা সম্বন্ধ না হয়, ততক্ষন কেউ কারো সম্মুখীন হয় না। যদি কোন মানুষ বা প্রাণী তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার সাথে অভদ্রতা করো না। ওকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্মানজনক ব্যবহার কোর।

যদি তৃষ্ণার্তকে জল, ক্ষুধার্তকে ভোজন, নগ্নকে বস্ত্র এবং আগন্তুককে নিজের দালানটি বিশ্রাম করার জন্য দাও তাহলে ভগবান শ্রীহরি তোমার উপর নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। যদি কেউ তোমার কাছে কোন জিনিষ চায় ও তোমার দেওয়ার ইচ্ছে না থাকে তো দিও না, কিন্তু তার সাথে অভদ্র ব্যবহার কোর না। সে যতই তোমার নিন্দে করুক, তবুও কটু উত্তর দিয়ে তুমি তার উপর রাগ কোর না। এই ভাবে এই ধবনের প্রসঙ্গে নিজেকে বাঁচিয়ে চললে, তুমি নিশ্চিতই সুখী হবে। পৃথিবী ওলট্-পালট্ হয়ে যাক, কিন্তু তোমার স্থির থাকা উচিত। সব সময় নিজের স্থানে স্থির থেকে গতিমান দৃশ্যটি শান্ত হয়ে দেখো। একে-অন্যকে আলাদা করে যে ভেদ ভাবের (দ্বৈত) দেওয়াল, সেটা নষ্ট করে দাও যাতে আমাদের মিলন সহজতম হয়ে যায়। দ্বৈত ভাবই (অর্থাৎ আমি আর তুমির ভেদ-বৃত্তি) শিষ্যকে নিজের গুরুর থেকে পৃথক করে দেয়।

তাই যতক্ষন এটি ধ্বংস না হয়ে যায় ততক্ষন অভিন্নতা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। "আল্লাহ মালিক" অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান এবং তিনি ছাড়া সংরক্ষকও আর কেউ নেই। তাঁর কার্য্যপ্রণালী অলৌকিক, অতুলণীয় ও কল্পনার অতীত। তাঁর ইচ্ছেতেই সব কাজ হয়। তিনিই পথ প্রদর্শন করে সব ইচ্ছে পুরণ করে দেন। ঋনানুবন্ধের কারণেই আমাদের সাক্ষাৎ বা সঙ্গম হয়। তাই পরস্পরের প্রতি প্রেমের ভাব নিয়ে একে-অন্যের সেবা করে সব সময় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যে নিজের জীবনের লক্ষ্য (ঈশ্বর দর্শন) প্রাপ্ত করে নিয়েছে, সেই ধন্য ও সুখী। অন্যরা তো নাম মাত্রে যতক্ষন প্রাণ আছে, ততক্ষণ জীবিত থাকে।

উত্তম বিচারকে উৎসাহদান ঃ-

শ্রী সাইবাবা সর্বদা উত্তম বিচারকে উৎসাহিত করতেন। তাই আমরা যদি প্রেম ও ভক্তি ভরে অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যাই তাহলে সহজেই অনুভব করতে পারব যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আমাদের কি ভাবে সাহায্য করেন। এক সাধুর উক্তি অনুসারে, ভোরবেলা যদি তোমার মনে কোন শ্রেষ্ঠ বিচার জাগে এবং সারাদিন সেটাই স্মরণ করলে, তোমার বিবেক অত্যন্ত বিকশিত হয়ে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। হেমাডপন্ত এই উক্তিটির সত্যতা অনুভব করতে চাইতেন। তাই এই পবিত্র শিরডী ভূমিতে পরের দিনটি (বৃহস্পতিবার) নামস্মরণ ও কীর্তন করে কাটাবেন এইরূপ মনোস্থির করে শুয়ে পড়েন। পরের দিন ভোরবেলা ওঠার সময় অনায়াসেই রাম নাম মুখে এসে যায় এবং তিনি খুবই প্রফুল্ল হন। নিত্যকর্ম সেরে কিছু ফুল নিয়ে বাবার দর্শন করতে যান। দীক্ষিত 'ওয়াড়া' পার করে বুটী 'ওয়াড়া'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মধুর ভজনের আওয়াজ শুনতে পান। এক নাথের এই ভজনটি ঔরাঙ্গাবাদকর মধুর সুরে বাবার সামনে গাইছিলেন -

গুরু-কৃপার ছায়া পেয়েছি ভাই।
রাম ছাড়া তো কিছুই নাই।
অন্তরে রাম, বাহিরে রাম,
স্বপ্নেও দেখি সীতারাম।।
জাগরনে রাম, শয়নে রাম।
যেদিকে দেখি, সেদিকেই রাম।।

ভজন তো অনেক আছে, কিন্তু বিশেষ করে এই ভজনটাই ঔরাঙ্গাবাদকর কেন

বেছে নিলেন? এটা বাবারদ্বারাই পরিকল্পিত বিচিত্র যোগাযোগ নয় কি? সবাই রামনামের জপকে প্রভাবসম্পন্ন এবং ভক্তদের ইচ্ছাপূর্তি ও কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অব্যর্থ উপায় বলেন। এ বিষয়ে সব সন্তদেরও একই মত।

নিন্দেসম্বন্ধীয় উপদেশ

উপদেশ দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ সময় বা স্থানের প্রতীক্ষা না করে বাবা যথাযোগ্য সময়েই উপদেশ দিতেন। একবার এক ভক্ত বাবার অনুপস্থিতিতে অন্য লোকেদের সামনে নিজের ভাইয়ের নিন্দাবাদ করছিল ও নিজের ভাইদের ওপর দোষারোপ করে এমন কটু বাক্য ব্যবহার করে যে, সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের ঘৃণা হতে লাগল। প্রায়ই দেখা গেছে যে, লোকেরা মিছিমিছি অন্যদের নিন্দে করে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। সাধুপুরুষেরা পরের দোষকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। তাদের বক্তব্য যে, শুদ্ধিকরণের নানা বিধি আছে, যেমন- মাটি, জল ও সাবান ইত্যাদি, কিন্তু নিন্দুকের ধারা একেবারে ভিন্ন। ওরা অন্যদের দোষগুলিকে শুধু নিজেদের জিভ দিয়েই দূর করে দেয় এবং এই ভাবে অন্যদের নিন্দে করে তাদের উপকারই করে। তাই তারা নিশ্চিতই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নিন্দুককে ঠিক পথে আনার জন্য সাইবাবার কার্য্যপদ্ধতি একেবারেই অন্যরকম ছিল। তিনি তো সর্বজ্ঞ, তাই সেই মহাশয়ের কার্য্যকলাপ অবিলম্বেই জেনে যান। দুপুরবেলা যখন লেণ্ডীর কাছে সেই মহাশয়ের সাথে দেখা হয়, তখন তিনি একটি শূয়োরের (যে বিষ্ঠা খাচ্ছিল) দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন- "দেখ, ও কত আনন্দ সহকারে বিষ্ঠা খাচ্ছে। তুমি মন ভরে নিজের ভাইদের বিষয়ে অপশব্দ বলে বেড়াচ্ছ এবং তোমার এই আচরণটাও ঠিক ওরই সমান। **অনেক শুভকর্মের পরিণাম স্বরূপই তুমি এই মানব দেহ পেয়েছ এবং তাও যদি তুমি এই ধরনের আচরণ করো তো শিরডী তোমায় কি ভাবেই বা সাহায্য** করতে পারবে?" ভক্তটি এই উপদেশটি গ্রহণ করে সেখান থেকে চলে যায়। এইরূপ প্রসঙ্গ অনুসারেই তিনি উপদেশ দিতেন। যদি সেগুলি মনে রেখে নিত্য পালন করা হয় তাহলে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বেশী দূরে থাকে না। একটা প্রবাদ আছে যে - "যদি হরি থাকে, তাহলে খাটিয়ার উপরে খাবার মেলে।" এই কথাটি খাওয়া ও পরার ব্যাপারে সত্য হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এই কথার উপর নির্ভর করে অলস হয়ে বসে থাকে, তাহলে সে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোনই উন্নতি করতে পারবে না বরং পতনের ঘোর অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই আত্মা-অনুভূতি প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের অনবরত পরিশ্রম করা উচিত। যত চেষ্টা সে করবে, ততই সেটা তার জন্য লাভদায়ক হবে।

বাবা বলতেন- **"আমি তো সর্বব্যাপী। সর্বভূতে ও চরাচরে ব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি অনন্ত।"** যাদের দৃষ্টিতে তিনি সাড়ে তিন হাতের মানুষ, তাদের ভ্রম দূর করার জন্যই স্বয়ং সগুণ রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। **তাই যে ভক্তরা অনন্য ভাবে তাঁর ধ্যান করে তারা তাঁর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত করে.** যেমন মাধুর্য্য ও মিছরি, ঢেউ ও সমুদ্র এবং চোখ ও কান্তির মধ্যে অভিন্নতা দেখা যায়। যারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি চায়, তাদের শান্ত এবং স্থির হয়ে ধার্মিক জীবনযাপন করা উচিত। অনাবশ্যক কটু শব্দ ব্যবহার করে কাউকে দুঃখ না দিয়ে সর্বদা ভালো কাজে ও কর্তব্যে সংলগ্ন থেকে, ভয় মুক্ত হয়ে অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যাওয়া উচিত। যারা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর লীলাগুলি শ্রবণ করে মনন করবে এবং অন্যান্য বস্তুর চিন্তা ছেড়ে দেবে, তারা নিঃসন্দেহে আত্ম-অনুভূতি প্রাপ্ত করবে। তিনি অনেককেই নাম জপ করে তাঁর শরণাগত হতে বলেছিলেন। 'আমি কে?' এই তত্ত্বটি জানবার জন্য যারা উৎসুক ছিল, বাবা তাদেরও লীলা শ্রবণ ও মনন করতে পরামর্শ দেন। কাউকে ভগবত লীলার শ্রবণ, কাউকে ভগবৎ পাদ পূজন, তো কাউকে আধ্যাত্মরামায়ণ ও জ্ঞানেশ্বরী বা অন্য ধার্মিক গ্রন্থের পাঠ ও অধ্যয়ন করতে বলতেন। কাউকে রাখতেন নিজের চরণের কাছে, তো কাউকে পাঠাতেন খণ্ডোবা মন্দিরে। কাউকে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করতে বলতেন তো কাউকে উপনিষদ বা গীতার অধ্যয়ণ করতে বলতেন। তাঁর উপদেশের কোন সীমা ছিল না। তিনি কাউকে প্রত্যক্ষ তো কাউকে স্বপ্নে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একবার তিনি এক মদ্যপের স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার বুকে চড়ে বসেন। যখন সে মদ পান ত্যাগ করার শপথ নেয়, তখন গিয়ে বাবা তাকে ছাঁড়েন। কাউকে মন্ত্র যেমন "গুরুব্রহ্মা" আদি মন্ত্রের অর্থ স্বপ্নে বোঝান এবং কিছু হঠযোগীদের হঠযোগ ছেড়ে চুপচাপ বসে ধৈর্য্য রাখতে নির্দেশ দেন। তাঁর সহজতম পথ ও বিধির বর্ণনা করা অসম্ভব। সাধারণ সাংসারিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে অনেক উদাহরণ দিতেন। তারই একটি নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

পরিশ্রমের জন্য মজুরী ঃ-

একদিন বাবা শ্রীমতি রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ীর সামনে এসে একটা সিঁড়ি আনতে বলেন। সিঁড়িটি এনে বাবার আদেশ অনুযায়ী সেটা বামন গোঁদকরের (পাশের বাড়ীটি) বাড়ীতে লাগানো হয়। বাবা বাড়ীর উপরে চড়ে যান এবং রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের ছাদের উপর দিয়ে হয়ে অন্য দিক্ দিয়ে নীচে নেমে আসেন। বাবার অভিপ্রায়টি কেউ বুঝতে পারে না। রাধাকৃষ্ণমাঈ সে সময়ে জ্বরে কাঁপছিলেন। হতে পারে যে, ওঁর জ্বর ঠিক

করার জন্যই তিনি এইরকমটি করেন। নীচে নেমে যে লোকটি সিঁড়ি এনেছিল, তাকে তিনি দুটাকা পারিশ্রমিক দেন। তখন একজন একটু সাহস করে জিজ্ঞাসা করে যে, এতটা টাকা দেওয়ার কি মানে হয়? বাবা উত্তরে জানান যে মূল্য না দিয়ে কাউকে দিয়ে পরিশ্রম করানো উচিত নয় এবং কর্ম্মীকে শীঘ্রই তার শ্রম অনুসারে উদার হৃদয়ে মজুরী দিয়ে দেওয়া উচিত।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।